

বড়দিদি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশ কালঃ ১৯২২

Published by

porua.org

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

বড়দিদি

প্রথম পরিচ্ছেদ

এ পৃথিবীতে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা যেন খড়ের আগুন। দপ্ করিয়া জুলিয়া উঠিতেও পারে, আবার খপ্ করিয়া নিবিয়া যাইতেও পারে। তাহাদিগের পিছনে সদা-সর্বদা একজন লোক থাকা প্রয়োজন,— সে যেন আবশ্যক অনুসারে, খড় যোগাইয়া দেয়।

গৃহস্থ-কন্যারা মাটির দীপ সাজাইবার সময় যেমন তৈল এবং শলিতা দেয়, তেমনি তাহার গায়ে একটি কাটি দিয়া দেয়। প্রদীপের শিখা যখন কমিয়া আসিতে থাকে,— এই ক্ষুদ্র কাটিটির তখন বড় প্রয়োজন,— উস্কাইয়া দিতে হয়; এটি না হইলে তৈল এবং শলিতাসত্ত্বেও প্রদীপের জ্বলা চলে না।

সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতিও কতকটা এইরূপ। বল, বুদ্ধি, ভরসা তাহার সব আছে, তবু সে একা কোন কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারে না। খানিকটা কাজ সে যেমন উৎসাহের সহিত করিতে পারে, বাকিটুকু সে তেমনি নীরব আলস্যভরে ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে। তখনই একজন লোকের প্রয়োজন— সে উস্কাইয়া দিবে।

সুরেন্দ্রের পিতা সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে ওকালতি করিতেন। বাঙলা দেশের সহিত তাঁহার বেশী কিছু সম্বন্ধ ছিল না। এইখানেই সুরেন্দ্র তাহার কুড়ি বৎসর বয়সে এম্.এ পাশ করে। কতকটা তাহার নিজের গুণে, কতকটা বিমাতার গুণে। এই বিমাতাটি এমন অধ্যবসায়ের সহিত তাহার পিছনে লাগিয়া থাকিতেন যে, সে অনেক সময় বুঝিতে পারিত না যে, তাহার নিজের স্বাধীন সত্তা কিছু আছে কি না! সুরেন্দ্র বলিয়া কোনো স্বতন্ত্র জীব এ জগতে বাস করে, না, এই বিমাতার ইচ্ছাই একটি মানুষের আকার ধরিয়া কাজকর্ম, শোয়া-বসা, পড়াশুনা, পাশ প্রভৃতি সারিয়া লয়! এই বিমাতাটি, নিজের সন্তানের প্রতি কতকটা উদাসীন হইলেও, সুরেন্দ্রর হেফাজতের সীমা ছিল না। থুথুফেলাটি পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিত না! এই কর্তব্য-পরায়ণা স্ত্রীলোকটির শাসনে থাকিয়া, সুরেন্দ্র নামে লেখাপড়া শিখিল, কিন্তু আত্মনির্ভরতা শিখিল না। নিজের উপর তাহার বিশ্বাস ছিল না। কোনো কর্মই যে তাহার দ্বারা সর্বাসুন্দর এবং সম্পূর্ণ

হইতে পারে, ইহা সে বুঝিত না। কখন যে তাহার কি প্রয়োজন হইবে, এবং কখন তাহাকে কি করিতে হইবে, সেজন্য সে সম্পূর্ণরূপে আর একজনের উপর নির্ভর করিত। ঘুম পাইতেছে, কি ক্ষুধা বোধ হইতেছে, অনেক সময়, এটাও সে নিশ্চিত ঠাহর করিতে পারিত না। জ্ঞান হওয়া অবধি, তাহাকে বিমাতার উপর ভর করিয়া, এই পঞ্চদশ বর্ষ কাটাইতে হইয়াছে। সুতরাং বিমাতাকে তাহার জন্য অনেক কাজ করিতে হয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাইশ ঘণ্টা তিরস্কার, অনুযোগ, লাঞ্ছনা, তাড়না, মুখবিকৃতি, এতদ্ভিন্ন পরীক্ষার বৎসর, পূর্ব হইতেই, তাহাকে সমস্ত রাত্রি সজাগ রাখিবার জন্য নিজের নিদ্রাসুখ-বিসর্জন দিতে হইত! আহা, সপত্নীপুত্রের জন্য কে কবে এত করিয়া থাকে! পাড়া-প্রতিবাসীরা এক মুখে রায়-গৃহিণীর সুখ্যাতি করিয়া উঠিতে পারে না।

সুরেন্দ্রের উপর তাঁহার আন্তরিক যত্নের এতটুকু ক্রটি ছিল না— তিরস্কার-লাঞ্ছনার পর-মুহূর্তে যদি তাহার চোখ-মুখ ছল-ছল করিত, রায়-গৃহিণী সেটি জুরের পূর্বলক্ষণ নিশ্চিত বুঝিয়া, তিন দিনের জন্য তাহার সাগু ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। মানসিক উন্নতি এবং শিক্ষাকল্পে, তাঁহার আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সুরেন্দ্রের অঙ্গ পরিষ্কার কিংবা আধুনিক রুচি-অনুমোদিত বস্ত্রাদি দেখিলেই তাহার সখ এবং বাবুয়ানা করিবার ইচ্ছা তাঁহার চক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়িয়া যাইত, এবং সেই মুহূর্তেই দুই-তিন সপ্তাহের জন্য, সুরেন্দ্রের বস্ত্রাদি রজক-ভবনে যাওয়া নিষিদ্ধ হইত।

এমনি ভাবে সুরেন্দ্রের দিন কাটিতেছিল। এমনি স্নেহ সতর্কতার মাঝে কখন কখন তাহার মনে হইত, এ জীবনটা বাঁচিবার মত নহে,— কখন বা সে মনে ভাবিত, বুঝি এমনি করিয়াই সকলের জীবনের প্রভাতটা অতিবাহিত হয়। কিন্তু এক এক দিন আশপাশের লোকগুলা গায়ে পড়িয়া তাহার মাথায় বিভিন্ন ধারণা গুঁজিয়া দিয়া যাইত।

একদিন তাহাই হইল। একজন বন্ধু তাহাকে পরামর্শ দিল যে, তাহার মত বুদ্ধিমান ছেলে বিলাত যাইতে পারিলে, ভবিষ্যতে অনেক উন্নতির আশা আছে। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া সে অনেকের অনেক উপকার করিতে পারে। কথাটা সুরেনের মন্দ লাগিল না। বনের পাখীর চেয়ে পিঞ্জরের পাখীটাই বেশী ছটফট করে! সুরেন্দ্র কল্পনার চক্ষে যেন একটু মুক্ত বায়ু, একটু স্বাধীনতার আলোক, দেখিতে পাইতেছিল, তাই তাহার পরাধীন প্রাণটা, উন্মত্তের মত, পিঞ্জরের চতুর্দিকে ঝটপট করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সে পিতাকে আসিয়া নিবেদন করিল যে, তাহার বিলাত যাইবার উপায় করিয়া দিতে হইবে। তাহাতে যে সকল উন্নতির আশা ছিল— তাহাও সে কহিল। পিতা কহিলেন, ‘ভাবিয়া দেখিব।’ কিন্তু গৃহিণীর ইচ্ছা একেবারে প্রতিকূল। তিনি পিতা-পুত্রের মাঝখানে ঝড়ের মত আসিয়া পড়িয়া এমনি অট্‌হাসি হাসিলেন যে, দুইজনেই শ্তম্ভিত হইয়া গেল!

গৃহিণী কহিলেন, “তবে আমাকেও বিলাত পাঠাইয়া দাও—না হইলে সুরোকে সামলাইবে কে? যে জানে না, কখন কি খাইতে হয়, কখন কি পরিতে হয়, তাকে একলা বিলাত পাঠাইতেছ? বাড়ীর ঘোড়াটাকে সেখানে পাঠান যা, ওকে পাঠানও তাই। ঘোড়া-গরুতে বুঝিতে পারে যে, তার খিদে পেয়েছে, কি ঘুম পেয়েছে— তোমার সুরো তাও পারে না—” তার পর আবার হাসি!

হাস্যের আধিক্য দর্শনে রায় মহাশয় বিষম লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। সুব্রহ্মনাথও মনে করিল যে, এরূপ অকাট্য যুক্তির বিপক্ষে কোনরূপ প্রতিবাদ করা যায় না। বিলাত যাইবার আশা সে ত্যাগ করিল। তাহার বন্ধু এ কথা শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইল। কিন্তু বিলাত যাইবার আর কোন উপায় আছে কি না, তাহাও সে বলিয়া দিতে পারিল না। কিন্তু অবশেষে কহিল যে, এরূপ পরাধীনভাবে থাকার চেয়ে ভিক্ষা করিয়া খাওয়া শ্রেয়ঃ; এবং ইহাও নিশ্চয় যে, এরূপ সম্মানের সহিত যে এম্, এ. পাশ করিতে পারে— উদরার জন্য তাহাকে লালায়িত হইতে হয় না।

সুব্রহ্ম বাটী আসিয়া এ কথা ভাবিতে বসিল। যত ভাবিল, তত সে দেখিতে পাইল যে, বন্ধু ঠিক বলিয়াছে— ভিক্ষা করিয়া খাওয়া ভাল। সবাই কিছু বিলাত যাইতে পারে না, কিন্তু এমন জীবিত ও মৃতের মাঝামাঝি হইয়াও সকলকে দিন কাটাইতে হয় না।

একদিন গভীর রাতে সে ষ্টেশনে আসিয়া কলিকাতার টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে বসিল, এবং ডাকযোগে পিতাকে পত্র লিখিয়া দিল যে, কিছুদিনের জন্য সে বাড়ী পরিত্যাগ করিতেছে; অনর্থক অনুসন্ধান করিয়া বিশেষ লাভ হইবে না, এবং সন্ধান পাইলেও যে, সে বাটীতে ফিরিয়া আসিবে, এরূপ সম্ভাবনাও নাই।

রায়-মহাশয় গৃহিণীকে এ পত্র দেখাইলেন। তিনি বলিলেন, “সুরো এখন মানুষ হইয়াছে, বিদ্যা শিখিয়াছে— পাখা বাহির হইয়াছে— এখন উড়িয়া পলাইবে না ত কখন পলাইবে!”

তথাপি তিনি অনুসন্ধান করিলেন— কলিকাতায় যাহারা পরিচিত ছিল, তাহাদিগকে পত্র দিলেন; কিন্তু কোন উপায় হইল না। সুব্রহ্ম কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতার জনকোলাহলপূর্ণ রাজপথে পড়িয়া সুব্রহ্মনাথ প্রমাদ গণিল! এখানে তিরস্কার করিবারও কেহ নাই, দিবানিশি শাসনে রাখিতেও কেহ চাহে না! মুখ শুকাইলে কেহ ফিরিয়া দেখে না, মুখ ভারি হইলেও কেহ লক্ষ্য করে না! এখানে নিজেকে নিজে দেখিতে হয়। এখানে ভিক্ষাও জোটে, করুণারও স্থান আছে, আশ্রয়ও মিলে, কিন্তু আপনার চেষ্টা চাই! স্বেচ্ছায় কেহই তোমার মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িবে না।

খাইবার চেষ্টা যে আপনাকে করিতে হয়, আশ্রয়ের স্থানটুকু যে নিজেকে খুঁজিয়া লইতে হয়, কিংবা নিদ্রা এবং ক্ষুধার মাঝে যে একটু প্রভেদ আছে — এইখানে আসিয়া সে এইবার প্রথম শিক্ষা করিল।

কতদিন হইল, সে বাড়ি ছাড়িয়াছে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া শরীরটাও নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছে, অর্থও ফুরাইয়া আসিতেছে— বস্ত্রাদি মলিন এবং জীর্ণ হইতে চলিল, রাতে শুইয়া থাকিবার স্থানটুকুরও কোন ঠিকানা নাই— সুব্রহ্মনের চক্ষে জল আসিল। বাটীতে পত্র লিখিতেও ইচ্ছা হয় না— বড় লজ্জা করে! এবং সকলের উপর যখন তাহার বিমাতার সেই স্নেহ-কঠিন মুখখানি মনে পড়ে, তখন বাটী যাইবার ইচ্ছা একেবারে আকাশ-কুসুম হইয়া দাঁড়ায়। সেখানে যে সে কখনও ছিল, এ কথা ভাবিতেও তাহার ভয় হয়।

একদিন সে তাহারই মত একজন দরিদ্রকে কাছে পাইয়া বলিল, “বাপু, তোমরা এখানে খাও কি করিয়া?”

লোকটা একরকম বোকা ধরনের— না হইলে উপহাস করিত! সে বলিল, “চাকরি করিয়া খাটিয়া খাই! কলিকাতায় রোজগারের ভাবনা কি?”

সুব্রহ্ম বলিল, “আমাকে একটা চাকরি করিয়া দিতে পার?”

সে কহিল, “তুমি কি কাজ জান?”

সুব্রহ্মনাথ কোন কাজই জানিত না, তাই সে চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

“তুমি কি ভদ্রলোক?” সুব্রহ্ম মাথা নাড়িল।

“তবে লেখাপড়া শেখনি কেন?”

“শিখেছি।”

সে লোকটা একটু ভাবিয়া বলিল, “তবে ঐ বড় বাড়ীতে যাও।
ওখানে বড়লোক জমিদার থাকে— একটা কিছু করিয়া দিবেই।” এই বলিয়া
সে চলিয়া গেল।

সুরেন্দ্রনাথ ফটকের কাছে আসিল। একবার দাঁড়াইল, আবার
পিছাইয়া গেল, আবার ফিরিয়া আসিল— আবার গেল। সেদিন আর কিছু
হইল না। পরদিনও ঐরূপ করিয়া কাটিল। দুই দিন ধরিয়া সে ফটকের নিকট
উমেদারি করিয়া তৃতীয় দিবসে সাহস সঞ্চয় করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।
সম্মুখে একজন ভৃত্য দাঁড়াইয়া ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, “কি চান?”

“বাবুকে—”

“বাবু বাড়ী নেই।”

সুরেন্দ্রনাথের বুকখানা আনন্দে ভরিয়া উঠিল— একটা নিতান্ত শক্ত
কাজের হাত হইতে সে পরিত্রাণ পাইল। বাবু বাড়ি নাই! চাকরির কথা,
দুঃখের কাহিনী বলিতে হইল না, ইহাই তাহার আনন্দের কারণ। তখন দ্বিগুণ
উৎসাহে ফিরিয়া গিয়া, দোকানে বসিয়া পেট ভরিয়া খাবার খাইয়া,
খানিকক্ষণ সে মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইল, এবং মনে মনে রীতিমত
আলোচনা করিতে লাগিল যে, পরদিন কেমন করিয়া কথাবার্তা কহিতে
পারিলে তাহার নিশ্চিত একটা কিনারা হইয়া যাইবে।

পরদিন কিন্তু উৎসাহটা তেমন রহিল না। বাটীর যত নিকটবর্তী হইতে
লাগিল, ততই তাহার ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। ক্রমে ফটকের
নিকট আসিয়া একেবারে সে দমিয়া পড়িল— পা আর কোন মতেই ভিতরে
যাইতে চাহে না! আজ তাহার কিছুতেই মনে হইতেছে না যে, সে নিজের
কাজের জন্যই নিজে আসিয়াছে— ঠিক মনে হইতেছিল, যেন জোর করিয়া
আর কেহ তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। কিন্তু দ্বারের কাছে সে আর উমেদারি
করিবে না, তাই ভিতরে আসিল। সেই ভৃত্যটার সহিত দেখা হইল। সে
বলিল, “বাবু বাড়ি আছেন, দেখা করবেন কি?”

“হাঁ।”

“তবে চলুন।”

এটা আরও কঠিন! জমিদারবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ি। রীতিমত সাহেবী
ধরনের সাজান আস্‌বাব-পত্র। কক্ষের পর কক্ষ, মারবেল-প্রস্তরের
সোপানাবলী, ঝাড়-লঠন, লাল কাপড়ে ঢাকা প্রতি কক্ষে শোভা
পাইতেছে, ভিত্তি-সংলগ্ন প্রকাণ্ড মুকুর— কত ছবি, কত ফটোগ্রাফ। এ
সকল অপরের পক্ষে যাহাই হউক, সুরেন্দ্রের নিকট নূতন নহে। কারণ,
তাহার পিতার বাটীও দরিদ্রের কুটীর নহে; আর যাহাই হউক, সে দরিদ্র
পিতার আশ্রয়ে এত বড় হয় নাই। সুরেন্দ্র ভাবিতেছিল— সেই লোকটির

কথা, যাহার সহিত দেখা করিতে, অনুনয়-বিনয় করিতে যাইতেছে,— তিনি কি প্রশ্ন করিবেন, এবং সে কি উত্তর দিবে!

কিন্তু এত ভাবিবার সময় নাই— কর্তা সম্মুখে বসিয়াছিলেন; সুব্রহ্মনাথকে প্রশ্ন করিলেন, “কি প্রয়োজন?”

আজ তিন দিন ধরিয়া সুব্রহ্ম এই কথাই ভাবিতেছিল, কিন্তু এখন সব ভুলিয়া গেল,— বলিল, “আমি—আমি—”

ব্রজরাজ লাহিড়ী পূর্ববঙ্গের জমিদার। মাথায় দুই চারিগাছা চুলও পাকিয়াছে—বাতিকে নহে, ঠিক বয়সেই পাকিয়াছিল। বড়লোক, অনেক দেখিয়াছিলেন; তাই চট্ করিয়া সুব্রহ্মনাথকে অনেকটা বুঝিয়া লইলেন, কহিলেন, “হাঁ বাপু, কি চাও তুমি?”

“কোন একটা—”

“কি একটা?”

“চাকরি—।” ব্রজরাজবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “আমি চাকরি দিতে পারি এ সংবাদ তোমাকে কে দিল?”

“পথে একজনের সহিত দেখা হইলে, আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সেই আপনার কথা—”

“ভাল। তোমার বাড়ী কোথায়?”

“পশ্চিমে।”

“সেখানে কে আছে?” সুব্রহ্মনাথ সব কথা বলিল।

“তোমার পিতা কি করেন?”

অবস্থাবৈগুণ্যে সুব্রহ্ম নূতন ধাঁচ শিখিয়াছিল— একটু জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল, “সামান্য চাকরি করেন।”

“তাতে চলে না, তাই তুমি উপার্জন করিতে চাও?”

“হাঁ।”

“এখানে কোথায় থাক?”

“কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই— যেখানে সেখানে।”

ব্রজবাবুর দয়া হইল! সুব্রহ্মকে কাছে বসাইয়া তিনি বলিলেন, “তুমি এখনও বালক মাত্র। এই বয়সে বাড়ী ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছ বলিয়া দুঃখ হইতেছে। আমি নিজে যদিও কোনও চাকরি করিয়া দিতে পারি না, কিন্তু যাহাতে কিছু যোগাড় হয়, তাহার উপায় করিয়া দিতে পারি।”

সুরেন্দ্রনাথ “আচ্ছা” বলিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া, ব্রজবাবু তাহাকে ফিরাইয়া বলিলেন, “আর কিছু তোমার জিজ্ঞাসা করিবার নাই?”

“না।”

“ইহাতেই তোমার কাজ হইয়া গেল? কি উপায় করিতে পারি, কবে করিতে পারি— কিছুই জানিবার প্রয়োজন বিবেচনা করিলে না?”

সুরেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। ব্রজবাবু সহাস্যে বলিলেন, “এখন কোথায় যাইবে?”

“কোন একটা দোকানে।”

“সেইখানেই আহার করিবে?”

“প্রতিদিন তাহাই করি।”

“তুমি লেখাপড়া কতদূর শিখিয়াছ?”

“কিছু শিখিয়াছি।”

“আমার ছেলেকে পড়াইতে পারিবে?”

সুরেন্দ্র খুসি হইয়া কহিল, “পারিব।”

ব্রজবাবু আবার হাসিলেন। তাঁহার মনে হইল, দুঃখে এবং দারিদ্র্যে তাহার মাথার ঠিক নাই! কেন না, কাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে, এবং কি শিক্ষা দিতে হইবে, এ কথা না জানিয়াই অতটা আনন্দিত হওয়া তাঁহার নিকটে পাগলামি বলিয়া বোধ হইল। বলিলেন, “যদি সে বলে, আমি বি, এ ক্লাসে পড়ি, তখন তুমি কি করিয়া পড়াইবে?”

সুরেন্দ্র একটু গম্ভীর হইয়া ডাবিয়া বলিল, “তা এক রকম হইবে—”

ব্রজবাবু আর কোন কথা বলিলেন না। ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, “বন্ধু, এই বাবুটির থাকিবার জায়গা করিয়া দাও, এবং স্নানাহারের যোগাড় দেখ।” পরে সুরেন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিলেন, “সন্ধ্যার পর আবার ডাকাইয়া পাঠাইব— তুমি আমার বাড়ীতেই থাক। যতদিন কোন চাকরির উপায় না হয়, ততদিন স্বচ্ছন্দে এখানে থাকিতে পারিবে।”

দ্বিপ্রহরে আহার করিতে গিয়া তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধবীকে ডাকাইয়া কহিলেন, “মা, একজন দুঃখী লোককে বাড়ীতে স্থান দিয়াছি।”

“কে, বাবা?”

“দুঃখী লোক, এ ছাড়া আর কিছু জানি না। লেখাপড়া বোধ হয়, কিছু জানে, কেন না, তোমার দাদাকে পড়াইবার কথা বলাতে, তাহাতেই সে স্বীকার করিয়াছিল। বি, এ ক্লাসের ছেলেকে যে পড়াইতে সাহস করিতে